অমরেন্দ্র

পবিত্র সরকার

কবে থেকে চিনি আমি অমরেন্দ্রকে? নিজেকে এই প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাই সেটা বোধ হয় ১৯৫৮ সাল হবে, নাকি ১৯৫৯? আমি তখন বঙ্গবাসী কলেজে পড়ি, বা সেই বছরেই পাশ করে বেরিয়ে গেছি বাংলা অনার্স, অমরেন্দ্র এল তাতেই নতুন বছরের ছাত্র হয়ে। আমার পরের পরের বছর। অমরেন্দ্র ধরিয়ে দিল যে, তারও অনেক আগে থেকে। আগে ওর সঙ্গে আমার আলাপের একটা ক্ষীণ সূত্র তৈরি হয়েছিল। ও ক্লাস নাইন থেকে 'বন্ধু' বলে একটা পত্রিকা প্রকাশ করত, থাকত বারুইপুরে। যতদূর মনে হচ্ছে আমার প্রয়াত ভাগনে সাংবাদিক রমেন দাসের (যিনি সবুজ সাথী নামে 'লোকসেবক' পত্রিকার ছোটদের পাতা পরিচালনা করতেন) ছোটদের পাতায় অমরেন্দ্রর ছড়া কবিতা বেরত। তাঁরই সূত্রে আমি অমরেন্দ্রর পত্রিকায় একটা ছড়া বা কিছু লিখেছিলাম। 'লোকসেবক' পত্রিকার অফিসেই প্রথম দেখা হয়ে থাকবে। সাহিত্যপ্রাণ হাফপ্যান্ট পরিহিত সুদর্শন এক স্কুল-ছাত্র, যার চোখদু'টি চমৎকার উজ্জ্বল। তাকে একবার দেখলে ভুলে যাওয়ার উপায় থাকে না। তখন থেকেই সে আমার এক অনুজের জায়গা স্বচ্ছন্দে অধিকার করে নিল।

কাজেই বঙ্গবাসীতে তার সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার পরিচয়। আমি ১৯৫৮তে কলেজ পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম, আমার ঠিক আগের বছরেই ছিলেন প্রয়াত বন্ধুবর কবি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি কলেজ পত্রিকাকে আগেকার মামুলি চেহারা থেকে বার করে এনে বিষয় ও সজ্জায় এক উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-পত্রিকার মর্যাদা দিয়েছিলেন। তার ফলে আমার এবং পরবর্তী সম্পাদকদের সুবিধে হয়েছিল– একটা আদল হাতে পাওয়া গিয়েছিল। তার থেকে নেমে আসা চলবে না। আমার পত্রিকাটিও খারাপ হয়নি, প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন আর-এক প্রয়াত বন্ধু পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। অমরেন্দ্র যখন আমার দু-বছর পরে ছাত্র ফেডারেশনের ইউনিয়নের সাহিত্য-সম্পাদক তথা পত্রিকা সম্পাদক হল তখন আমি ইউনিয়নের ছেলেদের বলেছিলাম, 'তোমরা একটি চমৎকার পত্রিকা-সম্পাদক পেলে।' এবং অমরেন্দ্র সে কথার সম্মান রাখবে আমি জানতাম, কারণ পত্রিকা প্রকাশ যে শুধু তার একটা নেশা ছিল তা নয়, ছাপার নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে তখনই তার অসামান্য দখল দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। সে আমারই মতো তার শিক্ষকদের, জগদীশ ভট্টাচার্য, অরুণ বসু প্রভৃতির স্নেহও

পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, পরে মুদ্রণ-নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে তার জ্ঞান আর সাহিত্য ও সম্পাদনা সম্বন্ধে তার উন্মাদনা তখনকার মুদ্রণ ও প্রকাশনা জগতের কিংবদন্তি, সিগনেট প্রেসের অধিকর্তা দিলীপকুমার গুপ্ত বা ডিকে-রও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বলে আমার মনে আছে। দিলীপকুমার গুপ্তের উদ্দীপনায় উৎসাহিত হয়ে সম্ভবত অমরেন্দ্রর যৌথ সম্পাদনায় প্রথম সাহিত্য-পত্রিকা 'সারস্বত' পত্রিকাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সচেতন পাঠকমহলে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। গৌরকিশোর ঘোষ আনন্দবাজার পত্রিকার কলকাতার কড়চায় যে উচ্চ প্রশংসা লিখেছিলেন তার শিরোনাম ছিল 'পত্রিকাস্টলে বিস্ফোরণ'। আমার কাছে পত্রিকার ওই নামটি ছিল বঙ্গবাসী ঘরানার স্মারক, কারণ অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের একটি প্রিয় শব্দ ছিল এই সারস্বত। তিনি এই নামকরণের পিছনে প্রেরণা ছিলেন কি না তা অমরেন্দ্রই বলতে পারবে।

২

বঙ্গবাসী থেকে পাস করে অমরেন্দ্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে এম এ পড়তে ভর্তি হল। আমি তখন যাদবপুরে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করছি, ফলে তার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত। আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে, সে ছাত্রজীবন শেষ করে মামুলি অধ্যাপকের জীবন বেছে নিতে চায় না, একটা বড় কিছু করবার জন্য ছটফট করছে। কিন্তু সেটা শুধুই নানা অভিনব পত্রিকার সুনিপুণ সম্পাদনায় সীমাবদ্ধ থাকবে, না অন্য কোনও দিকে বিস্তারিত হবে, তা হিসেব করার সাধ্য আমার ছিল না। তার নানামুখী স্বপ্নের মানচিত্র বুঝি তার আত্মজনদের কাছেও স্পষ্ট ছিল না। তাঁরা তার এই উদ্যোগগুলিকে কী চোখে দেখতেন তা অমরেন্দ্রর মুখ থেকে জানার কৌতূহল আমার আছে, এই কারণে এবং আরও নানা কারণে আমি তাকে একটি আত্মজীবনী লেখার জন্য ক্রমাগত তাগিদ দিয়ে চলেছি। বস্তুতপক্ষে তার 'সারস্বত' সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে রীতিমতো সাড়া ফেলেছিল। বড় কাগজের আশ্রয়ধন্য পত্রিকার বাইরে এমন সুমুদ্রিত, সুপরিকল্পিত এবং মর্যাদাপূর্ণ সাহিত্যপত্র যে এত তরুণ এক সম্পাদকের হাত থেকে বেরোতে পারে, এবং 'পূর্বাশা' (তখন প্রায় বিলীয়মান), 'চতুরঙ্গ', 'পরিচয়' ইত্যাদি সাহিত্যপত্রের পাশে স্থান দাবি করতে পারে, এমন ভাবা খুব কঠিন ছিল।

'সারস্বত' দীর্ঘজীবী হয়নি। কিন্তু যে পত্রিকাটি প্রকাশ করে অমরেন্দ্র বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে নিজের নাম স্থায়ীভাবে উৎকীর্ণ করল তার নাম 'কবিতা-পরিচয়'। তাও দীর্ঘজীবী হয়নি। কিন্তু তা সাহিত্যপাঠক, বিশেষত কবিতা-পাঠকদের মধ্যে রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছিল। কবিতার পত্রিকা এর আগে অনেক বেরিয়েছে, আমরা তাতে কিছুটা অভ্যস্তও ছিলাম। কিন্তু এ পত্রিকার অনন্যতা হল যে তা কবিতার পত্রিকা নয়, কবিতা পরিচয়-এর পত্রিকা। বিখ্যাত কবির একটি কবিতা একজন সুযোগ্য সমালোচক আলোচনা করবেন, এতে পাঠকের কাছে কবিতাটির অন্তর-বাহির আলোকিত হয়ে উঠবে। আর কিছু নয়, শুধু এই। বিদেশে মার্কিনি নব্য সমালোচনায় যে close reading-এর ঐতিহ্য তৈরি হয়েছিল, যেন তারই ধরনে কবিতার পর কবিতার আলোচনা নিয়ে একটি সংখ্যা। বাংলা পত্রপত্রিকার

ইতিহাসে, হয়তো ভারতীয় পত্রপত্রিকার ইতিহাসে, যতদূর জানি এ এক সম্পূর্ণ নতুন প্রয়াস। সে পত্রিকা সম্ভবত 'সারস্বত'-এর চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, কিন্তু তা কেন চিরস্থায়ী হল না এ আমাদের কাছে এক মহা আক্ষেপের বিষয়। এ ধরনের পত্রিকার প্রয়োজন কখনই ফুরোয় না, আর দ্বিতীয়ত, এ ধরনের পত্রিকা একটি সংস্কৃতির অহঙ্কার হয়ে থাকে। দুঃখের বিষয়, আর কোনও উদ্যোগী এ ধরনের একটি পত্রিকা প্রকাশে আর এগিয়ে আসেননি। একটাই সান্ত্বনা, পত্রিকাটির সব লেখা একত্র করে অমরেন্দ্র 'কবিতা-পরিচয়' নামেই একটি বই সম্পাদনা করেছে। বেরিয়েছে সম্ভবত দেজ থেকে, সেটি পরের প্রজন্মের পাঠকদের কাছে এক অতি মূল্যবান দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩

তারপরে আমি কিছুদিনের জন্য বিদেশে চলে যাই, অমরেন্দ্রর সঙ্গে, যেমন আরও অনেকের সঙ্গে, প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বছর ছয়েকের জন্য ছিন্ন হয়ে যায়। ফিরে আসার কিছুদিন পরে দেখি, অমরেন্দ্র একটা সাম্রাজ্য তৈরি করে ফেলেছে, এই সম্ভাবনা যে তার মধ্যে ছিল তা ভাবতে সাহস হয়নি। কিন্তু যাকে কর্মবীর বলে, অমরেন্দ্র সেই পদবিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এবং নানা ধরনের পত্রিকা প্রকাশ থেকে চমৎকার একটি প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানও নির্মাণ করেছে। সে তখন সাফল্যের বিগ্রহ, যাতে হাত দেয় তাতেই যেন সোনা ফলাচ্ছে। ১৯৮০তে 'কর্মক্ষেত্র' প্রকাশ থেকেই সম্ভবত তার এই খাড়া ওপরে ওঠার সিঁড়ি তৈরি হতে লাগল। বস্তুতপক্ষে পত্রিকা প্রকাশ আর সম্পাদনায় অমরেন্দ্র সব সময়েই নতুন আইডিয়া বা ভাবনার পরিচয় দেয়। দেশের বেকারদের সহায়তার জন্য একটি আস্ত পত্রিকা যে প্রয়োজন, আর তা যে এমন সকলের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এমন সর্বাঙ্গীণ করা যেতে পারে, তা অমরেন্দ্রের আগে কেউ ভেবেছে বলে মনে হয় না। এবং পরে তার অনুকরণে যে সব সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক বেরিয়েছে সেগুলিও 'কর্মক্ষেত্র'-র জনপ্রিয়তার কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি। 'কর্মক্ষেত্র'-য় আমার কবে থেকে ধারাবাহিক ইংরেজি শেখানো শুরু হল তা আজ আর মনে নেই, সম্ভবত নব্বইয়ের বছরগুলি থেকে। যে ধারাবাহিকতায় এটা আবার শুরু হয়েছিল সেটা একটু বলি। 'আজকাল' থেকে 'সকাল' বলে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেছিলেন সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত, তাতে তাঁরই আমন্ত্রণে আমি প্রথম 'সহজে ইংরেজি' নামে লিখতে শুরু করি, পরে যা 'হাসতে হাসতে ইংরেজি' নামে বই হয়ে বেরিয়েছে। তারই সূত্র ধরে অমরেন্দ্র আমাকে 'কর্মক্ষেত্র'-য় 'কাজের ইংরেজি' লিখতে বলে, এবং আমিও মহাফুর্তিতে কয়েক বছর চাকুরিপ্রার্থীদের জন্যে সে লেখা চালিয়ে যাই। প্রাথমিকে ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী ছিলাম (এখনও আছি) বলে আমি গত শতকের আশির বছরগুলিতে প্রচুর গালাগাল খেয়েছি, এখনও খাই না তা নয়, কিন্তু আমার জেদ চেপে গিয়েছিল যে, বাংলার মাধ্যমে একটু পরের দিকেও ইংরেজি শেখানো সম্ভব, একটু ভালোভাবেই সম্ভব। তাই অমরেন্দ্রর আমন্ত্রণ পেয়ে আমি বর্তে গেলাম। নিশ্চয়ই আমার চেয়ে যোগ্যতর মানুষ ছিলেন বঙ্গভাষী অঞ্চলে, ইংরেজির ডিগ্রিধারীরা তো প্রচুর ছিলেন।

কিন্তু তাঁদের কেউ এই তুচ্ছ কাজে এগিয়ে আসেননি দেখে আমাকেই কলম ধরতে হয়। এর মধ্যে অমরেন্দ্র তার স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী থেকে আমার ছড়ায় ইসপের গল্প 'কথামালা ছড়ায় ঢালা' প্রকাশ করেছে, কিন্তু কাজের ইংরেজিটার পাণ্ডুলিপিটা তৈরি করেও কী করে যেন গণ্ডগোল হয়ে গেল। যাই হোক, পরে 'আজকাল' পত্রিকায় আরও দীর্ঘদিন সাপ্তাহিক মুখ দেখানোর পর, তা বছরখানেক আগে 'ইংলিশের পাঠশালা' নামে প্রকাশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, সে বই অমরেন্দ্রকেই উৎসর্গ করা হয়েছে। তাছাড়াও আরও অনেক রকমের লেখা লিখেছি 'কর্মক্ষেত্র'-য়, সব আমার গৃহে রক্ষিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

ছোটদের সাপ্তাহিক কাগজ 'ছেলেবেলা' বার করেছিল অমরেন্দ্র ১৯৮২তে, তাতেও প্রচুর ছড়া লিখেছি আমি। ১৯৯৩-এ বার করল আর-একটি অসাধারণ মাসিক 'ভ্রমণ' এবং তা মুহূর্তমধ্যে ভ্রমণপিপাসু সব বাঙালির মনোহরণ করে নিল। তাতে আমি একাধিক ভ্রমণকাহিনি লিখেছি। মনে পড়ছে 'মিয়ানমারের বৃত্তান্ত', 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর উৎস থেকে মোহানায় পরিক্রমা', 'রাজপুতানা ভ্রমণ' এবং আরও কত কী। তার 'কালের কষ্টিপাথর'-এ (২০১২) আমার 'মৃত্যু' নিয়ে লেখাটা প্রায় পুরোটা বেরিয়েছিল, যা পরে কারিগর বই হিসেবে বার করেছে।

৪

অত্যন্ত সৃজনশীল কবি ও লেখক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী যে এই সম্পাদনা আর প্রতিষ্ঠান-নির্মাণ কর্মোদ্যোগের মধ্যে হারিয়ে যায়নি, এটা আমাদের পক্ষে একটা বিপুল স্বস্তির ঘটনা। বিস্ময়েরও বটে, এবং এই ভেবে বিস্ময় বোধ করি যে, এটা কী করে সম্ভব। সে একটার পর একটা পত্রিকা প্রকাশ করেছে, একসঙ্গে একাধিক পত্রিকা, নানা ধরনের পত্রিকা সম্পাদনা আর প্রকাশ করেছে, প্রকাশনা করেছে, 'ভ্রমণ'-এর সূত্রে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছে, এমনকি বাঙালিরা কদাচিৎ যে সব দেশে বা ভূভাগে পা রাখেনি সেই সব অঞ্চলে সে ক্যামরা নিয়ে মহানন্দে ঘুরে বেড়িয়েছে, টেলিভিশনে সে-সব বাঙালিকে দেখিয়েছে নিজের ভাষ্য সহ। আর তার পাশাপাশি সে কবিতা লিখেছে, ছোটগল্প লিখেছে, লিখেছে ছোটদের জন্য বিশ্ববিখ্যাত সব বই। কত ভাষায় অনূদিত হয়েছে তার অসামান্য বই 'শাদা ঘোড়া'। লিখেছে চমৎকার সব ভ্রমণকাহিনি, ছোটগল্প, নানা আকারের উপন্যাস, রূপকথা, ছোটদের অ্যাডভেঞ্চার আর 'বরফের বাগান'-এর মতো বিচিত্র রহস্যকাহিনি। এত দিকে এত ভাবে ও নিজেকে দেয় কী করে, কীভাবে? সময়, সেই সঙ্গে নিজের মন আর শরীরকে শাসনে রাখার কোন কৌশল ওর জানা যেটা আমরা কেউ জানি না। তারপরে বছর কয়েক আগে থেকে কী শুরু করল? না, ছবি আঁকা! প্রথমে ভেবেছিলাম এ তার একটা সাময়িক খেয়াল, দু-দিনেই কেটে যাবে! কোথায় কী! এ ছেলে যা ধরে তা ছাড়বার পাত্র নয়। প্রথমে যাকে মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতিচ্ছায়া, পরে দেখি তার মধ্যে দিব্যি একটি চরিত্র ফুটে উঠছে, অমরেন্দ্রর নিজের একটা স্বাক্ষর, এবং তার হাত শিল্পকে সহজেই ছুঁতে পারছে। তার দিকে তাকিয়ে আমাদের বিস্ময় তো হয়ই, নিস্ফল ঈর্ষাও হয়, প্রকৃতি এত বিচিত্র ক্ষমতা একজনকে কেমন করে দেয়?

আমার মনে আছে যে একবার, ১৯৯২ সালে সম্ভবত সে পার্ক হোটেলে 'কর্মক্ষেত্র' পত্রিকার দ্বাদশ বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল, এবং কর্মক্ষেত্র পড়ে নানা স্বনিয়োগের উদ্যাগে এগিয়ে আসা বেশ কিছু ছেলেমেয়েকে পুরস্কারও দিয়েছিল। তখন আমি রবীন্দ্র ভারতীতে। তাতে আমাকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেখানে বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম যে, বাঙালি মধ্যবিত্ত ছেলেরা জীবিকা বা কাজের বেলায় ভদ্র জীবিকা এই ধারণাটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ফলে চায়ের স্টল বা তেলেভাজার দোকান এই ধরনের ব্যবসার কথা তারা ভাবতেই পারে না। এই বক্তৃতা কাগজে প্রায় হেডলাইন পেয়ে যাওয়ায় আমার ছাত্ররা আমাকে অভিযোগ করেছিল, কেন আমি তাদের ওইসব হীন জীবিকা নিতে উৎসাহিত করছি। আমার ভাবনা অবশ্য এখনও একই আছে, আমি মনে করি, সাদা কলারের চাকরির মোহ বাঙালি সন্তানের সম্ভাবনাকে অনেকটা সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। ইদানীংকালে স্বনিযুক্তিতে বাঙালির শ্রেষ্ঠ সফলতার উদাহরণ অমরেন্দ্র নিজে, তাই আমি বার বার ওকে একটা আত্মজীবনী লিখতে বলি, যাতে অন্য ছেলেমেয়েরা একটা দিশা আর উৎসাহ পায়।

আমার মনে হয় অমরেন্দ্রর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার এবং সাফল্যের একটা মূল কারণ তার সহজ, প্রসন্ন ব্যক্তিত্ব আর সুন্দর, সকলের পক্ষে সুখদায়ক ব্যবহার। ওর এই সাফল্যযাত্রা নিশ্চয়ই নির্বিঘ্ন হয়নি, নানা ঈর্ষা ও প্রতিকূলতা, হয়তো শত্রুতার বাধা ওকে পেরোতে হয়েছে। কিন্তু তা ওর সদাচরণ এবং প্রসন্নতাকে ব্যাহত করতে পারেনি। অমরেন্দ্রর আতিথেয়তা আমি তার বাড়িতে আর অন্যত্র বহুবার উপভোগ করেছি। বাড়ির ছাদে তাদের একটি অসাধারণ বাগান আছে, তার স্ত্রী সর্বাণীর সৃষ্টি। ফুল ফল শাকসবজির সেই বাগানের পরিচর্যায় সেও মনোযোগী, মাঝেসাঝে হাতও লাগায়। আবার বিস্মিত হয়ে ভাবি, সে এত সময় পায় কখন! তার স্ত্রী সর্বাণীও অশেষ গুণের মেয়ে, শুধু ঘরের নয়, অমরেন্দ্রর বাইরের কাজেরও অনেক কিছু সে একা সামলায়। শুনেছি, তাদের অফিসের কাজ ছাড়াও, কখনও কখনও বিদেশে অমরেন্দ্রর ছবি তৈরিতে সে শুটিংয়ের স্থানকালের বিবরণ নোট করে।

একটা আনন্দের খবর সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিই যে, অমরেন্দ্রর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নানা যোগাযোগে পরের প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তারিত হয়েছে। আমার বড় মেয়ে বসুধিতি আর অমরেন্দ্রর বড় মেয়ে মহাশ্বেতা একই বয়সি, এবং তারা যাদবপুর বিদ্যাপীঠে পরস্পরের সহপাঠিনী। দুজনে অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে। মহাশ্বেতা এখন অমরেন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত হয়ে তার পত্রিকা-সংসারের হাল ধরেছে, দেখে আমি আনন্দিত বোধ করি। আমার মতো অমরেন্দ্ররও দুই মেয়ে, তারা দু-জনেই নানা গুণের আধার। ছোট মেয়ে মৈত্রেয়ী তো ফরাসি ভাষায় অতি পারঙ্গম ও শিক্ষক, নিজেও লেখক এবং চমৎকার অনুবাদ করছে ফরাসি থেকে।

জীবনের দাম যাচাই করার একটা সূত্র হল সে জীবন অন্যদের কাছ থেকে কতটা নিয়েছে, আর অন্যদের জীবনে কতটা ইতিবাচক হয়ে উপস্থিত থেকেছে। অমরেন্দ্র সারা জীবনের সামাজিক কাজগুলি বহু মানুষের জীবন নির্মাণে বিপুলভাবে সাহায্য করেছে তা আমি জানি। এ সব ইতিহাস সব সময় সামনে আসে না, কিন্তু এলে ভালো হয়। অমরেন্দ্র যা করেছে তা গভীরতর অর্থে দেশের কাজ, মানুষের কাজ। তার জন্য

রাষ্ট্রের কাছে তার স্বীকৃতি আর পুরস্কার অবশ্যই পাওয়া উচিত। এখনও তা তার কাছে পৌঁছয়নি দেখে আমার খারাপ লাগে। আর কাছের লোকেদের জীবনেও অমরেন্দ্রর মতো একটি মানুষ জীবনে নানা দান, নানা পুষ্টি ও সম্বল নিয়ে আসে। অমরেন্দ্রর প্রীতি ও ভালোবাসা সেইরকম আমার আর আমার পারিবারিক জীবনকেও বহু স্বস্তি ও আনন্দের জোগান দিয়েছে। তার আশি বছর পার হতে চলল, আরও অনেক সুন্দর আর সাফল্যের বছর তার প্রতীক্ষায় আছে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আশীর্বাদ ইত্যাদিতে বিশ্বাস নেই, কিন্তু তার জন্যে আমার অগ্রজের গভীর স্নেহ অন্তহীন থাকবে।